জীবনানন্দ দাশ

মহীতোষ বিশ্বাস

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

॥ এক ॥

'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।'— একথা বলেছিলেন জীবনানন্দ। কিন্তু জীবনানন্দ যে একজন আদ্যন্ত কবি, এ-বিষয়ে আজ আর কারুর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু কবি নন, রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবেও যে তাঁর নামটিই আজ দীপ্যমান, এটাও কোনো অতিকথা নয়। জীবৎকালে কিছু মানুষের অপভাষ তাঁকে দীর্ণ করেছে। আবার কয়েকজন শুভৈষী অনুব্রতীর সান্নিধ্য আর অভ্যর্থনা দুদণ্ডের শান্তিও দিয়েছিল তাঁকে। ঘাতক মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল অকালে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টির ক্রম-উন্মোচন তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিল বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অবিকল্প এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়-পুরুষ কবি জীবনানন্দ।

কবি জীবনানন্দ দাশ। জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি। জন্মস্থান পুব বাংলার বরিশাল শহর। পিতার নাম সত্যানন্দ দাশ। মা কুসুমকুমারী দাশ। সত্যান্দের আসল উপাধি 'দাশগুপ্ত'। কবির ঠাকুরদা সর্বানন্দের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার গাউপাড়া গ্রামে। গ্রামটিকে গ্রাস করে নেয় কূলঙ্কষা

পদ্মা। সর্বানন্দ নতুন বাসস্থান নির্মাণ করেন বরিশাল শহরে। সর্বানন্দের সাত ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলেরা হলেন হরিচরণ, সত্যানন্দ, যোগানন্দ, অতুলানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ। মেয়েদের মধ্যে একজনের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। সবার ছোটো ছিলেন স্নেহলতা দাশ। তিনি বিয়ে করেননি। বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। মূলত দেশের সেবাতেই তিনি উৎসর্গ করেন নিজেকে। সর্বানন্দের মেজো ছেলে সত্যানন্দই কবি জীবনানন্দের বাবা।

জীবনানন্দের ঠাকুরদা সর্বানন্দ দাশগুপ্ত গাউপাড়া থেকে প্রথম বরিশালে আসেন কালেকটারি অফিসে চাকরি নিয়ে। বরিশালে চাকরি করার সময় স্থানীয় কয়েকজন ব্রাহ্ম নেতার সংস্পর্শে আসেন সর্বানন্দ। তাঁদের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন তিনি।

ব্রাহ্মদের তখন অনেকেই সুনজরে দেখতেন না। সর্বানন্দের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণকেও গাউপাড়ায় তাঁর জ্ঞাতি ও আত্মীয়-স্বজনেরা মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে সর্বানন্দের। অবশ্য ধীরে ধীরে পরে অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিকও হয়ে এসেছিল। সর্বানন্দ কিন্তু গাউপাড়ার বদলে কর্মস্থান বরিশালেই বসবাস করতে থাকেন।

সর্বানন্দের অন্য ছেলেরা নিজের নিজের কাজের সুবাদে বেশির ভাগ সময়ই থাকতেন বরিশালের বাইরে। বরিশালের বাড়িতে থাকতেন শুধু সত্যানন্দ ও বড়ো ভাই হরিচরণ। হরিচরণ এবং সত্যানন্দ দুজনেই ছিলেন স্থানীয় ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষক। সত্যানন্দ ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক। অঙ্কের শিক্ষক ছিলেন হরিচরণ।

সর্বানন্দ তাঁর চাকরি জীবনে নিজস্ব কোনো বাড়ি তৈরি করতে পারেননি বরিশালে। ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। ছেলেরা বড়ো

হয়ে নিজস্ব বাড়ি তৈরি করেন। বরিশালের বগুড়া রোডের ওপর প্রায় ছয় বিঘা জমির ওপর তৈরি হয় বাড়িটি। আম কাঁঠাল লিচু নারিকেল আর হরেক রকম ফল-ফুলের গাছে ভরা বড়ো মনোরম ছিল সেই বাসস্থানটি। ছেলেরা বাড়ি করে বাবার নামে বাড়ির নাম রাখলেন 'সর্বানন্দ ভবন।'

জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ ছিলেন বি এ পাস। কৃতবিদ্য মানুষ ছিলেন তিনি। নানা বিষয়েও ছিল তাঁর দক্ষতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার কাজ। তখন শিক্ষকদের বেতন ভালো ছিল না। কিন্তু অর্থলোভ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। শিক্ষকতার প্রতি আন্তরিক টানেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে। সত্যানন্দ ছিলেন একজন আদর্শবাদী শিক্ষক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি সঞ্চার করে দিতে পেরেছিলেন গভীর আদর্শ-বোধ ও অনুপ্রেরণা। স্কুলের বাইরে বাড়িতেও তাঁর কাছে ছাত্রদের আসা-যাওয়া ছিল প্রতিনিয়ত। বাবার কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ লিখেছেন— 'লৌকিক সফলতার চূড়ায় পৌঁছবার ... আশ্চর্য ক্ষমতা সত্ত্বেও তিনি একান্তই নিজের ইচ্ছায় শিক্ষাব্রতই গ্রহণ করলেন— অত্যন্ত সাধাসিধে ভাবে বরিশালের ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশনে। তাঁর সম্মুখে নানারকম অর্থকরী পথ উদ্দীপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি সচেতন ভাবে এবং আন্তরিক প্রেরণায় স্থির করলেন যে শিক্ষকই হতে হবে।'

শুধু আদর্শ শিক্ষকই নন, সত্যানন্দ ছিলেন যথার্থই সংস্কৃতিবান এক উন্নত মনের মানুষ। বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি ছিলেন আচার্য, উপাসক এবং বক্তা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন তিনি কিন্তু কোনো গোঁড়ামি তাঁকে স্পর্শ করেনি কখনও। সব ধর্মের প্রতিই ছিল তাঁর অমৎসর উদার সমদৃষ্টি। নিয়মিত বিদ্যাচর্চা করতেন তিনি। সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার ছিল তাঁর। বরিশালের ব্রাহ্মদের পক্ষ

থেকে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন কিছুদিন। নানা বিষয়ে তাঁর বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটিতে। মননশীল এই প্রবন্ধগুলিতে তাঁর অসাধারণ মুক্তমনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের রাজনৈতিক হীনাবস্থা সম্পর্কেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সচেতন।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দাশ। তাঁর জন্ম বরিশালেই। কুসুমকুমারীর বাবা চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত চাকরি করতেন বরিশালের কালেকটারিতে। মায়ের শিক্ষা-জীবনের কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ লিখেছেন— 'তিনি কলকাতায় বেথুন স্কুলে পড়তেন। খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাস (এখনকার দশম শ্রেণি) অবধি পড়েছিলেন, তার পরেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। তিনি অনায়াসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুব ভালোই করতে পারতেন, এ বিষয়ে সন্তানদের চেয়ে তাঁর বেশি শক্তি ছিল মনে হচ্ছে।' শ্বশুরবাড়িতে একান্নবর্তী পরিবার। লোক সংখ্যা অনেক। সে পরিবারের বেশির ভাগ কাজ-কর্মের দায়িত্বই পালন করতে হত কুসুমকুমারীকে। তাঁর কর্মনিপুণতা আর দক্ষ পরিষেবায় শান্তি বিরাজ করত সংসারে। কুসুমকুমারীর এই অক্লিষ্টকর্মা সেবাপরায়ণতা শুধু নিজেদের পরিবারের মধ্যেই নয়, তা সম্প্রসারিত হত দুঃস্থ দরিদ্র পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যেও। কারো কোনো বিপদের কথা শুনলেই সেখানে এগিয়ে যেতেন কুসুমকুমারী।

কুসুমকুমারীর মধ্যে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বশক্তি। সংসারের নানা দায়-দায়িত্ব আর পরিশ্রমের মধ্যেও নষ্ট হয়নি তাঁর এই গুণটি। কাজকর্মের ফাঁকে-ফাঁকেই,অতি দ্রুত কবিতা লিখতে পারতেন তিনি। মার কবিতা-রচনার প্রসঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছেন—'কি রকম তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন তিনি! রান্না ঘরে রান্না করছেন, পিসেমশায় আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী এসে বললেন—এখুনি

'ব্রহ্মবাদী'র ফর্মা প্রেসে যাচ্ছে, অবিলম্বেই একটি কবিতা লিখে দাও কুসুম।... অমনি মা খাতা-কলম নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে একহাতে খুন্তি আর একহাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত— যেন চিঠি লিখছেন, বড়ো একটা ঠেকছে না কোথাও! আচার্য চক্রবর্তীকে প্রায় তখুনি কবিতা দিয়ে দিলেন, পরে 'ব্রহ্মবাদী'র পৃষ্ঠায় তা পড়ে স্বভাব-কবিদের কথা মনে পড়তো আমার।'

কুসুমকুমারীর মধ্যে ছিল আমাদের দেশের 'লোককবিদের স্বভাবী সহজতা', আর সেইসঙ্গে আশ্চর্য প্রসাদ-গুণ। ছোটোদের জন্য লেখা তাঁর 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। কবিতাটির কয়েকটি ছত্র—

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হয়ে, কাজে বড়ো হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ' হইতে হবে এই যার পণ।

পল্লি-প্রকৃতির এক অনুপম নির্ব্যাজ উপস্থাপনা রয়েছে অন্য একটি কবিতায়—

ছোটো নদী দিনরাত বহে কুলকুল
পর পারে আমগাছে থাকে বুলবুল।

কিন্তু কুসুমকুমারী তাঁর এই সহজাত শক্তিটিকে ধরে রাখতে পারেননি। শেষদিকে তিনি কবিতা লেখা একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। মার এই অপচিত গুণটির কথা স্মরণ করে খিদ্যমান জীবনানন্দ লিখেছেন—'মা যদি নিজের তখনকার জীবনের কবিতা লেখার বিশিষ্ট ঐতিহ্য অত তাড়াতাড়ি নিরস্ত না করে ফেলতেন, তা হলে অনেক কিছুই হতে পারত। যে সাহিত্যিক ও কবির গরিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেটাকে অন্তর্দমিত করে রাখলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না।'